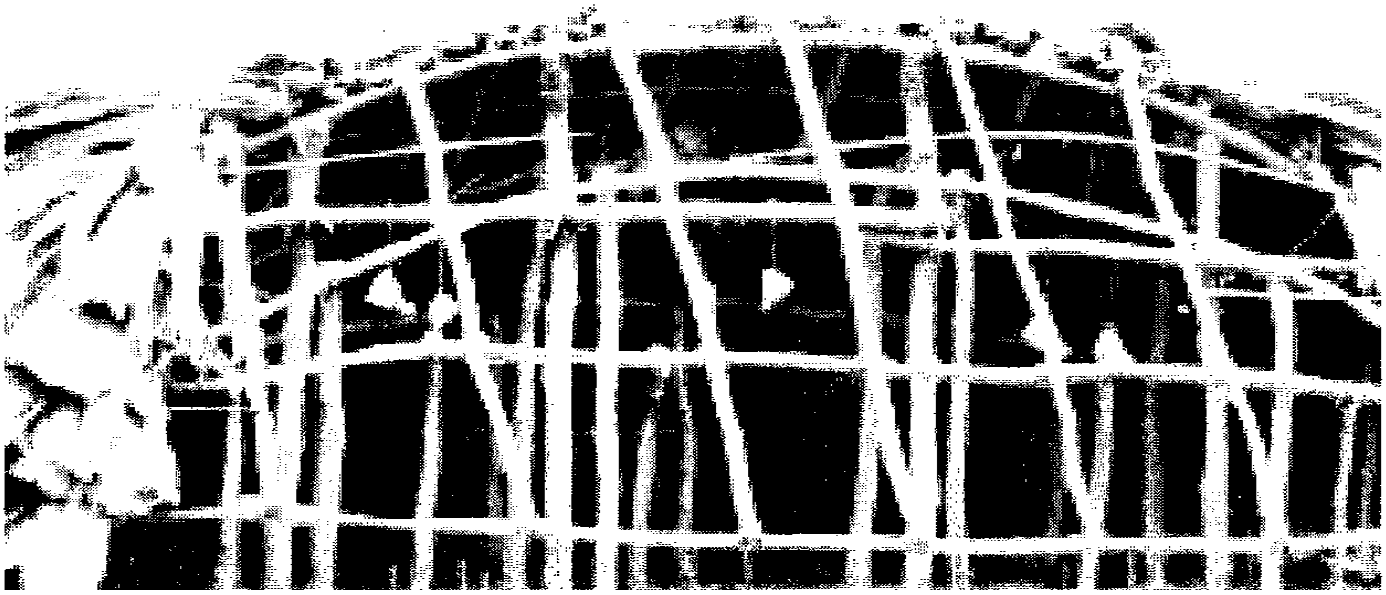

আন্দামানে আদিবাসীদের ঘর । ছবি : এ এন এস আই-এর সৌজন্যে

আদি-অধিবাসী ও শব্দসূত্র

মহীদাস ভট্টাচার্য

(অধ্যাপক, স্কুল অফ ল্যাংগোয়েজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)

"মুচকে হাসির জন্য বাংলা অমরকোষের কাছে ঋণী নহে। মচকান শব্দের অর্থ বাঁকান, বাঁকাইতে গেলে যে মচ করিয়া ধ্বনি হয় সেই ধ্বনি হইতে এই কথার উৎপত্তি কিভাবে যে হয়েছে তার হিসেব মেলাতে গেলে বহু অজানা তথ্য আমাদেরকে চমৎকারিত্ব দান করে। জগতের নিয়মই এই। মানুষ তার চারপাশে যা পায় তার থেকে নতুন বা যা প্রয়োজনীয় তাকে আত্মস্থ করে নেয়। যে দেশে যত জাতি-উপজাতির আগমন ঘটেছে, উদয় হয়েছে, একত্রে সংঘাত ও সমন্বয়ে কালাতিপাত করেছে সেদেশেই পরস্পরের কাছ থেকে দেওয়া-নেওয়ার, আত্মস্থ করার কতো ইতিহাস যে রয়েছে তার হিসেব কে রাখে? কাল বয়ে চলে যায়। উত্তরকালের সৃষ্টির ক্ষমতা এসে তাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে নেয়। নতুন রূপে আত্মস্থীকৃত বিষয় হিসবে হয়ে নতুনের সম্পদে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই কর্মকাণ্ডে আপনার অতীতও বাইরে থাকে না। তাই ঝোল, ঝিঙ্গে, ঝাঁটা (অ) দিশি হয়ে যায়। দোয়াত, কলম, জামা, জমি, দরজা জানালা, জায়গা, হাওয়া, বই, পুস্তক, চেয়ার, গ্লাস,

টেবিল, স্কুল, কলেজ, ঘুঘনি, লুঙ্গি, লিচু, দাম এগুলো বাইএর থেকে এসে হয়ে যায় আপনার। বারে বারে ঠাঁই পেতে পেতে সে হয়ে যায় বর্তমানের। মুছে যায় অতীতের দাতার অবদানের শেষ চিহ্নটুকুও। আরও বদলে আমাদের মতো করে সাজিয়ে নিই। কালিকট, কালিঘাট???>ক্যালকাটা > কলিকাতা, > কলকাতা > কোলকাতা : এই যে ঘটনা প্রবাহ তা আসলে অতীতকে সরিয়ে, নিজের মতো করে, সাজিয়ে নেওয়ার প্রবনতা। এই ভাবেই নতুনের প্লাবনে সব অতীত চাপা পড়ে যায় নতুন পলিমাটির আস্তরণের নীচে। এঠিক কি ভুল সে বিতর্ক করার অবকাশ রয়েছে। তবে এটি ঘটছে। এ যে সকল সময় সচেতন ভাবে সক্ষমের উদ্যোগে ঘটে ব্যাপারটা তা নয়। অসম ব্যবহারের কারণে, পৌনঃপনিকতার পরিসংখ্যান গত আধিক্যেও ঘটে। ভাষার উপকরণগুলো যখন সেই নতুন আদলে ব্যবহারে সামাজিক রূপ পেয়ে যায় তখন সেটি সে ভাষার উপকরণের দাবিদার হয়ে পড়ে। ভাষা সংযোগ, ভিন্নভিন্ন ভাষাভাষীর পারস্পারিক সংযোগে এরকম একটা ব্যাপার ঘটে। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটগুলি অস্পষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু কখনও সমাজেরই প্রয়োজন সেগুলোর দিকে ফিরে দেখতে হয়।

সমাজ বিকাশের যে নিয়ম চলে আসছে সেই আদিম অসংরক্ষিত স্বাধীনতার যুগ থেকে সেটি সংরক্ষিত স্বাধীনতার যুগে এসে সংখ্যাধিক্যের আওতায় চলে আসার ফলে, স্বল্প সংখ্যকের বর্তমান ও অতীত অনেকটাই গৌণ হয়ে পড়েছিল পশ্চিমের আলোকে, জাতীয়তাবাদের বিকাশের যুগে। সেখানে আপাত স্বাধীনতার দাবি মুখ্য হয়ে দেখা দেওয়ার কারণে বহু ক্ষেত্রেই বহুজাতি সমন্বিত একটি ভূখণ্ডে সংখ্যাধিক্যের দাবি সামনে থেকে গিয়েছে। চিন্তা ও যুক্তির অধিকারীর নতুন আলোকে আলোকিত হয়ে সামনের সারিতে যাঁরা ছিলেন তাঁরা তাঁর নিজের উপকরণের ব্যাপারে সতর্ক হয়েছেন অনেক বেশি। পশ্চাতের যারা থেকে গিয়েছেন পশ্চাতে। অসমতা থেকেছে। শুধু কি তাই? নিজের শ্রেষ্ঠতার দাবি মুখ্য হয়েছে বারে বারে। কখনও ব্যস্ত থেকেছেন অপরকে হেয় করে, কখনও অজান্তে কেবল নিজেকে নিয়েই। নিজের অতীত গৌরবে যতোখানি ব্যস্ত হয়েছেন অপরের যে একটা অতীত থাকতে পারে তাও বিস্মৃত হয়েছেন। প্রফেসর সুনীতিকুমার আমাদের আর্য্যামি নিয়ে বহু আলোচনা করেছেন। তিনি আর্য ও অনার্যের বিশ্লেষণের সময়ও অন-আর্য শব্দটির নিন্দার্থ ব্যবহার দেখেছিলেন। কিভাবে বিশেষ সামাজিক, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ক্ষমতা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ সমাজের মধ্যে যে ভেদ জন্ম দীর্ঘদিন ধরে, লালিত হয়েছে আমাদের সংস্কৃতিতে তা প্রতক্ষ্য করেছিলেন তিনি। অনার্য যে আর্য নয় এই মনোভাবের পাশাপাশি 'অনার্য' সম্পর্কে একটা উপেক্ষার মনোভাব আর্যসভ্যতার বিকাশের পর্বের শুরু থেকেই যুক্ত হয়েছিল, তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। লিখেছেন— *অনার্যদের সম্বন্ধে*

এখন ভারতবর্ষে—বিশেষতঃ আর্য্যভাষী উত্তরভারতে যে একটা জুগুপ্সার ভাব এসে গিয়েছে, অনার্য শব্দটিই তার জন্য কতকটা দায়ী। কারণ একটি শব্দের অর্থ সময়ের সাথে সাথে বদলে যায়। আর্যের পাশাপাশি 'আর্য নয়' তা বোঝাতে যে শব্দটি ব্যবহৃত হতো তা বোঝাতে 'অনার্য' শব্দটির ব্যবহার শুরু হলেও ধীরে ধীরে সেই 'নয়-আর্য' মানুষগুলির সংস্কৃতি, জীবনরীতি, আহারবিহার সবগুলি বোঝাতে এটি ব্যবহৃত হতে থাকল। এই ব্যাপারটি ভারতের মাটিতে বহু অনর্থের ভিত্তি হয়ে রয়েছে আজও। তিনি লিখলেন—"অনার্য্য শব্দ যদি খালি অন-আর্য অর্থাৎ—আর্য নয় বা আর্য্যজাতি সম্পৃক্ত নয় এই অর্থেই প্রযুক্ত হত, তা হলে কথা ছিল না; কিন্তু অনার্য অর্থে ঘৃণ্য, নীচ এই অর্থ সংস্কৃত যুগ থেকে এসে যাওয়ায়, শব্দটি জাতি-বাচক বা সভ্যতা-বাচক আর না থেকে মানসিক ও নৈতিক অপকর্ষ-বাচক হয়ে দাঁড়িয়েছে।"—(হিন্দু সভ্যতার পত্তন-সুনীতিকুমার, নির্বাচিত রচনা সংকলন)। অথচ ৫০০ খৃষ্টাব্দ পূর্বে এই অনার্যরাই ছিল এদেশের সব। এদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ভার ছিল যথেষ্ট। লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের সচিব প্রদীপ ঘোষ একটি বইয়ের ভূমিকায় ঠিকই লিখেছেন যে আদিবাসী-চর্চার সবটাই ইতিবাচক নয়। একটি ধারা আদিবাসীদের সংহত সুস্থ সমাজজীবনের কোনো পরিচয় না নিয়েই, তাঁদের সামাজিক রীতিনীতির অন্তর্গূঢ় তাৎপর্য অনুধাবন না করেই, তাঁদের সমাজ-মানসিকতার উজ্জ্বল দিকগুলি অবহিত না হয়েই প্রবন্ধ লেখা হতে লাগল। ফলে আদিবাসী জনগোষ্ঠী তাঁদের চোখে অসভ্য-বর্বর-কুৎসিত-হিংস্র প্রভৃতি অভিধায় চিত্রিত হলেন। যেমন করে ব্রিটিশ প্রভুরা ভারতীয়দের ধর্মচ্যুত, পতিত ও অসংস্কৃত ভাবত, তেমনি ছিল বাঙালি বুদ্ধিজীবির কিছু অংশের মনোভাব আদিবাসীদের ব্যাপারে। আবার অন্য একটি দিকও জন্ম নিয়েছিল পরম মমতায় আদিবাসী জীবনের সাথে একাত্ম হয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে বহু অজানা তথ্য আমাদের সামনে এনেছেন। (বাংলা সাময়িক পত্রে আদিবাসীকথা। ভূমিকা-প্রদীপ ঘোষ।)। সেখানেই মিলেছে বহু অজানা অতীতের অনুরণিত তরঙ্গের আভাস। সেগুলিই বলে দেয় আজকের বর্তমান হল নতুনের প্রেক্ষাপটে একটা অতীতের পরিণতি, যেখানে রয়েছে শুধু আমার নয়, আমারই পূর্বপুরুষের নয়, বহুযুগের বহুমানুষের চেতন ও অবচেতন দেওয়া-নেওয়া। সমাজবিকাশের চিন্তাবিদরা তাঁরা যে মনোভাবেরই হোক না কেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই কথাটিই বলে এসেছেন। তিনি ডারউইন হোন বা লুই হেনরি মর্গ্যান হোন, বা ফ্রয়েড, মার্কস, এঙ্গেলস বা আমাদের ভাষাচার্যই হোন এগুলিই তাঁদের ভাবনায় নানা ভাবেই উপস্থাপিত হয়েছে।

নতুন ভাবনার যুগে অতীতের অকৃত্রিম অবদানের কথা স্মরণ করে হয়তো 'আদি' শব্দটি চয়িত হয়েছিল। কিন্তু সেই 'আদি' অকৃত্রিমতা প্রধান স্রোতের পরিবর্তনের

গতিশীলতার মাঝে শব্দটির তাৎপর্যের ভারকে ধরে রাখতে পারেনি। পিছিয়ে পড়ে অকৃত্রিমতার সরল দাবিটুকু নিন্দার্থের প্রবাহের মধ্যে গিয়ে পড়েছে। এই ব্যাপারটা সামনে না রাখলে বর্তমান যে একটা অতীতের পরিণতি এই খেয়াল থাকে না। এটি আমরা বোঝার চেষ্টা করছি আজ বিশেষ উদ্যোগী হয়ে। ভূখণ্ডের পাহাড়ে, পর্বতে, গুহার দেওয়ালে, মাটির নীচে, মন্দির-মসজিদের গায়ে, পোড়ো প্রাসাদের অন্দরে-কন্দরে, আমাদের অবচেতন ভাবনায়, সংস্কৃতিতে, নিত্য চিত্তের অনুশীলনে কী রয়েচে তাকে খোঁজার নিরন্তর প্রয়াস চলেছে। 'আদিবাসী' শব্দটি সেই অর্থে আজ বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মনে রাখতে হবে আদি-অকৃত্রিমের অবদানগুলি রেখে গেছেন যাঁদের পূর্বসূরী, অদৃষ্টের পরিহাসে বা ইতিহাসের বিজয়রথকে সামনে নিয়ে যাঁরা আসতে পারেননি এরা তাঁরাই। সমাজের বিবর্তনের নানা ঘটনা প্রবাহে তাঁদের পেছনে যেতে হয়েছে। ইতিহাস পেছনে ফেলে দিয়েছে। 'আদি' শব্দটির যে গৌরবের আকাংক্ষা প্রত্যাশা করি আমরা সেখানে যেন একটা ছেদ পড়েছে। নিন্দার্থের দিকে এর ঝোঁক দেখা যাচ্ছে বহু ক্ষেত্রে। হয়তো বাইরে নিয়মসভার আবেদনে তা স্পষ্ট নয়। কিন্তু আমাদের সংস্কৃতির ফল্গু স্রোতে এই ব্যাপারটা বয়ে চলছে নীরবে। সেখানে সত্যটি না জানলে আন্তর্জাতিকতা তো আকাশকুসুমের মতো বিষয় হয়ে দাঁড়াবে, জাতীয় বলতে যা বুঝি সেটির মধ্যেও অটুট প্রাণশক্তির স্পর্শ পাওয়া যাবে না। এদেশের ইতিহাসের যে ছবি আমরা পেয়েছি। তাতে আদিবাসী শব্দটির গৌরবের অতীত নানা কারণেই ঐতিহ্যের আলোকে অলঙ্কৃত হওয়ার সুযোগ পায়নি। সিধু-কানু বা বীরসামুণ্ডার তর্পণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে গিয়েছে মাত্র। বহু ক্ষেত্রেই আদিবাসী শব্দটির পেছনে না-সূচক অনুরণন ব্যবহারিক প্রেক্ষাপটে পাওয়া যায়। সে অভিমানের প্রকাশ ঘটছে নিত্য, অতি অভিমান যেমন সত্যকে ঝাপসা করে দেয় তেমনি পেছনে না ফেলার দাবিও তো ফেলে দেওয়া যায় না, তা যুক্তি গ্রাহ্যও বটে। রাষ্ট্রীয় সহানুভূতির ব্যাপারটি রয়েছে। কিন্তু তা দিয়ে তো স্বীকৃতির সংস্কৃতি জন্ম নেয় না। আদি সবকিছুর জন্য আমাদের গৌরব থাকলেও আদিবাসীর গৌরবে আমরা কতোখানি নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করি তা সন্দেহের। কারণ সমাজবিবর্তনের পথে নানা উত্থান-পতনে ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটে চলেছে। সেখানে কেউ এগিয়ে থাকে কেউ পেছনে। পশ্চাতের মানুষগুলি তার পরাজয়ের গ্লানির মধ্যেও এখন কিছু ছাপ রেখে যায় যা আমাদের ইতিহাস, সংস্কৃতি, সমাজ ও তার বিন্যাসে সক্রিয় থাকে। তার হাজিরার জানান দিয়ে যায়। একটি ছোটো উপকরণেই একটি সত্যের বীজ উপ্ত হয়ে থাকে।

ভাষা ও ভাষার উপকরণ এক্ষেত্রে উপকরণের অন্যতম একটি উৎস। তার শব্দভাণ্ডার, শব্দগঠন, বাক্য গঠন, ছন্দ, শ্বাসাঘাত, সুরতরঙ্গ সবকিছুর মধ্যেই হয়েছে

অতীতের ছবি। ভাষার গোটা ব্যাপারটাই সময়ের ক্রমে অবস্থান করে। বিশেষ কালের সাপেক্ষে তাকে ধরে রাখার প্রয়াস তাকে বর্তমানের সীমানায় বেঁধে রাখতে চায়। অনেক সময় তাই অতীতটি তত প্রয়োজনীয় নয় বলেই একধরণের ভ্রান্তি মাঝে মাঝে জন্ম নেয়। কারণ বর্তমানের কাঠামোটাকে আমাদের ধরতে হবে ঠিক ঠিক করে। বর্ণনামূলক ভাষা পাঠের আলোচনা যাঁরা করেন তাঁদের মধ্যে এটি কাজ করে কখনও কখনও অতি সক্রিয়ভাবে। কিন্তু যখন আমরা বহুভাষীর জাতীয়তাবাদের বা আন্তর্জাতিকতাবাদের আঙ্গিনায় দাঁড়াতে চাই তখন আমার অতীত বর্তমান দুটিই আমার সমাজ ভাবনার চঞ্চলতার উৎস হিসেবে দেখতে হবে। সেখানে কোনো জেগে থাকা একটি উপকরণই হয়তো আমাদের দূরে সরে যাওয়ার সংস্কৃতির মাঝে লুকিয়ে থাকা পরমাত্মীয়তার সংবাদ দিতে পারে। যেমন করে দিয়েছিল 'পতের' আর 'পিতৃ' এই দুয়ের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে আমরা মেনে নিয়েছি আমাদের সুদীর্ঘ অতীতে হারিয়ে যাওয়া পরমাত্মীয়তার উৎসের বিষয়গুলি। তাই আমার ভাষার শব্দভাণ্ডার, অন্যান্য উপকরণ আমার কাছে অমূল্য সম্পদ। সেখানে একটি শব্দ কবে কিভাবে এল এই ইতিহাসের সূত্র ধরে বুঝে নিতে পারি অতীতের অনেক হারিয়ে যাওয়া কথাগুলি। আজকের স্থিতিশীল সমাজের উদ্ভবের আগে কোনপথে কিভাবে কোথায় কি ছাপ রেখে গিয়েছে তা বিচার করতে এই উপকরণগুলি সাহায্য করে।

অপরের কাছ থেকে শুধু ভাব তো আসে না। আসে ভাব-ভাষা মিলিমিশে, আমার ভাবে নতুন রূপ নিয়ে আমার হয়ে যায়। ভুলে যাই। কখনও কি ভেবে দেখেছে *বাদুড়ের* (দে-শি) ডানা মেলায় রাতের যে বিভীষিকার ছবি এঁকে চলি তার উৎস আসলে দেশি কোনো জাতিউপজাতির থেকে এসেছে। *বাদুড়ঝোলা* (দে) হয়ে হয়ে বাসে যাওয়ার বাহাদুরিও তো কম নয় সেক্ষেত্রে। *পতঙ্গের* (অ-স্ট্রিক) ডানা মেলায় *গজ* (অ) লোকের বিশেষণের উৎস যে অস্ট্রিক উপজাতির দান তার হিসেবে কি আমরা রেখেছি। আমরা কাব্যরচনা করে চলেছি। রসের সৃষ্টি করছি। *দুন্দুভি* (অ) বেজে উঠে ডিমডিম রবে সাঁওতাল পল্লীতে (দ্র-বিড়)। উৎসব হবে। ছড়ার এই ছন্দের দোলায় যে নান্দনিকতাই থাক তার উৎসের মুখও কিন্তু অমরকোষ নয়। *মসৃণ চিক্কণ* (দ্রা) *কৃষ্ণ কুটিল (দ্রা)* (রবীন্দ্রনাথ) দিয়ে অগাধ জলরাশির বিশ্লেষণ দিয়েছি তখন মনের ভাবের সাথে ওই শব্দগুলির উৎস কি তা নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা থাকে কি? তটভূমিতে দাঁড়িয়ে জেলেদের চুনো মাছের টানে *কাক* (দ্রা) *বকের* (দ্রা) যে ভিড় জমে তা যে দ্রাবিড় শব্দ জাত সে কি আমরা ভেবে দেখেছি। *পূজার ফুল ফল চন্দন* সবই যে ওই পথ ধরে আমাদের ধর্মের ঘরে বাসা বেঁধেছে সেইটে ও তো জানিনে। বা ভুলে গিয়েছি কালের পরিবর্তনের সাথে। বিস্মৃত হবো কি এই অতীত?

বেলফুল শব্দটা নিয়ে বড্ড মাথা ব্যথা ছিল না কোনো দিন। শব্দটার উৎস নিয়ে সন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেল সেখানে ধারণাটি স্পষ্ট নেই। কেউ কেউ আঠাবেলের ফুলের সামঞ্জস্য দেখে বললেন এর উৎস ওখান থেকে। তাতেও তাঁদের কুল রক্ষা হয় না করাণ *বেল* যা থেকে এসেছে সেই *বিল্ব* শব্দের উৎস দ্রাবিড় পরিবার। ব্যাপারটা আরও জটিল হয়ে গেলো যখন মালয়ালমে 'বেল্ল পু' শব্দটির সাথে পরিচয় হলো। হিন্দু কেরল রমণীর কেশসজ্জায় এই *বেল্ল পু* যার অর্থ 'সাদা ফুল' এর নিত্যব্যবহার নতুন করে দ্রাবিড় পরিবারের সাথে পরিচিতির ব্যাপারটি স্পষ্ট করে দিল। তখন নিজের অতীত নতুনভাবে চিত্তে দোলা দিয়ে গেল, বেশ কয়েক বছর আগে, যখন দ্রাবিড়িয়ান ভাষায় *চেড়ি* শব্দটা পাওয়া গেল। শৈশবে বেলায় আমরা 'সীতাউদ্ধার' বলে একটি খেলায় বিকেলের পড়ন্ত বেলায় মেতে উঠতাম। কেউ কেউ মেদিনীপুরের প্রত্যন্ত প্রদেশে খেলাটার নাম দিয়েছিল 'বৌমারি'। সেখানে সীতা বা বউ দূরে রাবণের গোল গণ্ডীরেখার মধ্যে ঘেরা থাকত। তাকে ঘিরে রাখত চেড়িরা। দূরের এক আয়তাকার বক্স থেকে রাম একটা দম নিয়ে দৌড়ে এক শ্বাসে চেড়িদের তাড়া করত। রাম চেড়িদের ছুঁলেই মারা পড়ত তারা। ফলে তারা সবসময়ই ভয়ে সীতাকে ছেড়ে পালাত। তারপর কায়দাকরে সেই দমেই সীতাকে নিয়ে কেউ যাতে ছুঁতে না পারে সেইভাবে হাত ধরে রাম তাকে ঘরে নিয়ে আসত। এই খেলা খেলেছি মেদিনীপুরের সেদিনের অজপাড়াগাঁয়ে। ভুলেই ছিলাম। কিন্তু যখন মালয়ালম ভাষায় *চেড়ি* শব্দটার সাতে পরিচিত হল তখন সব গোলমাল হয়ে গেল। শব্দের উৎস খোঁজার খেয়াল চাপবে তাদের যাঁরা সুনীতিবাবুর ওডিবিএল ও অন্যান্য রচনার সাথে বা সুকুমারবাবুর রচনাগুলির সাথে পরিচিত হয়েছেন। আমার ক্ষেত্রেও তাই হল। সেই খেয়ালে শৈশবের সমৃতি উৎস নতুন করে মাথায় চেপে বসল। চেড়ি শব্দটি বাংলায় গালাগাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে। কিন্তু এল কোত্থেকে। অভিধানে খুঁজে দেখলাম চেটিকা, চেটি, চেড়ি সবই দাসী, বা নারী প্রহরী হিসেবে রয়েছে। উৎস হিসেবে সংস্কৃত চেট্ এর উল্লেখ রয়েছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে মায়ের কোলে বসে ছবিতে অশোককাননে 'চেড়ি-পরিবৃত সীতার' পাতাটাও মনে হলে। সংসদ অভিধানের বাইরে গেলাম মনিয়ার উইলিয়ামে শব্দটির উৎস দেখতে। সেখানে বলা হয়েছে 'চেট' হলো দাস। এর ব্যবহার রয়েছে মৃচ্ছকটিকে, কথাসরিৎসাগরে, ভর্তৃহরির রচনাতে পাওয়া যায়। 'চেটক' মানে হলো দাস। এটিও পাওয়া উত্তরকালের সংস্কৃতি। অর্থাৎ শব্দটি অনার্য উৎসের দিকে হাত বাড়াতে হয়। এরই পাশপাশি পেয়ে গেলাম *'কম্যুনিস্ট চেড়ি'*। কেরালায় শব্দটি ব্যবহৃত হয় একধরণের লতাকে বোঝাতে। কোনো রাজনৈতিক বিদ্বেষের জন্য বিষয়টি উল্লেখ করেছি তা নয়। শব্দটির লোকো ব্যবহারের রীতিটি এতে লুকিয়ে

রয়েছে। লোকের ধারণায় পঞ্চাশের দশকে সেখানে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের সফলতার সময় সেগুলোর প্রাদুর্ভাব জন্ম নিয়েছিল। আমরা চিকুনগুনিয়াতে সপরিবারে বিপন্ন যখন তখন সবাই পরামর্শ দিতেন এই কম্যুনিস্ট-চেড়ির পাতা দিয়ে ফোটানো জলে স্নান করলে উপকার হয়। করেওছিলা বেশ কয়েকদিন। মনে হয়েছিল কিন্তু একটা ফল ফলেছে। চেড়ি শব্দের প্রতি আগ্রহ বেড়ে গিয়েছিল নতুন করে। বেশ কিছুদিন পরে শোভাম্যাডাম আমার সহকর্মী বিকেলে বাগানে ফুল গাছে জল দিতে একটি ছোটো চারাগাছ আমার সামনে তুলে ধরে বললেন এই চারাগুলোকে চেড়ি বলে। বড়ো গাছের পাশে ছোটো ছোটো যেগুলো রয়েছে সেগুলো হলো চেড়ি। সংস্কৃতের উত্তরকালের ব্যবহার আর এই ব্যবহারটি দেখে মনে হলো আসলে আমার ছেলেবেলার চেড়ির উৎসে অনার্য উৎসই সম্ভবত বেশি শক্তিশালী। সংস্কৃতির ফেরে বাংলায় এসে অথবা অীততের দ্রাবিড় সভ্যতার অবশিষ্টাংশ হিসেবে অর্থাবনতির মধ্যে দিয়েও শব্দটি হয়তো আজও সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসের জানান দিচ্ছে।

বাংলাভাষার শব্দভাণ্ডারে ব্যাপারটা আজও পরিষ্কার হয় না যা যখন বলি ঢাক, ঢোল, ঠোঙ্গা, ডিঙ্গি এই শব্দগুলোর দেশি বলে আমরা বলে থাকি। এই দেশি বলার সময় গৌরববোধ কেউ দেখিয়েছেন বলে মনে হয় না। এগুলোর উৎস আমাদের নিয়মের পাওয়া গেল না। সুতরাং দিশি। যেন খানিকটা এই রকম অর্থাৎ যাদের বাছবিচার নেই তো সব দিশি। পশ্চিমের আলো পৌঁছান পর একদলের মধ্যে এইরকম একটি বোধ সচেতন ভাবে না হলেও অবচেতন ভাবে প্রশ্রয় পেয়েছে। অতীতের আর্য-অনার্য ভেদেও এটা ঘটেছিল। দিশি মানে খানিকটা আদিবাসী এই রকম একটা ভাব জন্ম নেয়। সুনীতিবাবু ঠিকই বলেছিলেন যে—'কুক্ষণে এদেশে বিলেত থেকে নতুন ক'রে 'আর্য্য' শব্দের আমদানি হয়েছিল; ম্যাক্স মূলারের লেখা প'ড়ে, আর নব্য হিন্দুয়ানির দলের বিজ্ঞানের আর ইতিহাসের বদহজমের ফলে, একটা নোতুন গোঁড়ামি এসে আমাদের ঘাড়ে চেপেছে, সেটার নাম হচ্ছে 'আর্য্যামি'। এই গোঁড়ামি আমাদের দেশে নানা স্থানে নানা মূর্তি ধ'রেছে—স্বাধীনচিন্তার শত্রু এই বহুরূপী রাক্ষসকে নিপাত না ক'রলে ইতিহাস চর্চা বা ভাষাতত্ত্বের আলোচনা-কোনোটারই পথ নিরাপদ হয় না।" (বাংলা ভাষার কুলজী-সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সবুজপত্র ১৩২৫)। এই আর্য্যামির দাপটে দিশির গৌরব নষ্ট হয়েছে। এই সত্যটাই মাথা তুলেছে। সর্বঙ্গ বেদে আছে এই ভাবনা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ছি। বহুত্বের পৃথিবীকে সরিয়ে রাখার প্রবণতা বাড়ছে। নিত্য ঠাকুর ঘরে সংস্কৃত শব্দে মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে ভুলেই গিয়েছি পূজা শব্দটাই সংস্কৃতের নয়। *চন্দনের* গন্ধে মাতোয়ারা দেবতার মন্দির, আলোর *মালায়* ভরে উঠেছে প্রাঙ্গন। *মল্লিকা মুকুলের* গন্ধে মাতোয়ারা

বাতাস, *মুক্তোর মালা* গলায়, মাথায় *মুকুট*, *মুরলীর* মৃদুতান, দূরে *কাননের* পথে *তালতমালের* সারি, সবই দ্রাবিড় তরঙ্গে আন্দোলিত হয়ে গেল। *ময়ূরের* নৃত্যে কালিদাসও মুগ্ধ হয়েছিলেন সেটিও যে আর্যামির বাইরের জগতের সংযোজন। তা বিস্মৃত হয়েছি আমরা।

ধ্বনি পরিবর্তনের নিয়ম দেখিয়ে এগুলোর উৎস পাওয়া যায় না। কারণ এগুলোর ধারাবাহিক ব্যবহার ও তার বিবর্ধিত রূপের চিত্রও আমাদের সাহিত্যে তেমন করে মেলে না। কোনো কোনোটি আজ গ্রাম্য বা গেঁইয়া শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে। পাড়া, ঘোমটা, গাড়ি, ঝাড়, ঢিল, কামড়, খোঁড়া, ঝোপ, ডিঙ্গানো, ডেকরা, ডাহা, ডাঁসা, গোড়া ইত্যাদি শব্দগুলোর তৎসম তদ্ভব উৎসের ব্যাখ্যায় হিসেব মেলে না। কোনোটা বা একেবারে গ্রাম্য। কিন্তু আমাদের পরিচিতি তো তার সাথে প্রাণের। যার সাথে আমার শৈশব যুক্ত হয়ে রয়েছে সেই স্থাননামগুলির দিকে তাকালে কোনো ভাবেই আর্য্যামির ঠাঁই নেই। বগুড়া, কুমিল্লা, সুড়ি, ইগড়া, জাগুলিয়া, নড়াইল, গুর্‌পা, হাড়কান্দি, নড়াইল, মুড়াইল, ভীলাকান্দি, ময়নাগুড়ি, উলা, দেবড়া ডেবরা, ভাদুড়িয়া, ঝিকড়াগাছী ইত্যাদি কতো গাঁ আইরি ক্ষেতের আড়ে লুকিয়ে রয়েছে তার হিসেব হয়তো নির্বাচন কমিশনের তালিকায় রয়েছে কিন্তু আমাদের হিসেবে মেলে না। এগুলো কিন্তু কুরুক্ষেত্র, কনৌজ, ইন্দ্রপ্রস্থ, মৎসা, গান্ধার, বিদিশা, বিদেহ এসব থেকে একেবারে পৃথক। তাই ওগুলো প্রায় আদিবাসী জাত। কিন্তু আজও উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। আমাদের আনন্দ দেয়। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই এর উপস্থিতি। এর উৎসে আর্য্যামির বাইরে গেলেই সমভব হয়। আমাদের প্রবাদ, বাগধারা গান, কবিতা, ছড়া সবের যে নান্দনিক পরিতৃপ্তি রয়েছে তাও তো আর্যামির বাইরে। ধরুন কেউ যদি ছড়া কেটে বলে:—

চামচিকেতে চিমটি কাটে চিংড়ি মাছের চ্যাংড়া খোকা,
বাদায় বসে বংশীবাজায় বংশবেড়ের বঙ্কু বোকা। (সংগৃহীত)

এর বেশ কিছু শব্দ রয়েছে যার উৎস জানি না। সহজভাবে অভিধানেও মিলবে না। কিন্তু এ তো আমাদের কারুরই সৃষ্টি। লোকের প্রবাদের মধ্যে রয়েছে। হাজির হয়েছে নানা রূপে। অর্থাৎ অতীতের একটা শক্ত ভিতের ওপর গড়ে উঠেছে কালের বিবর্তনে কিছু ছেড়ে কিছু যোগ করে কিছুকে ভেঙ্গে নতুন করে সাজিয়ে-গুছিয়ে। এতো একটি জাতির বৈভব। কিন্তু আমরা মাঝে মাঝে বিস্মৃত হয়ে যাই। এরই মাঝে নিন্দার্থক আদিবাসী বোধ অতিসূক্ষ্মভাবে আমাদের ভেদের সংস্কৃতি বোধ জাতির মহত্বের বৈভবে একটা কালো দাগ কেটে দিচ্ছে। ভুলে যাচ্ছি যে ভাষার পেছনে থাকে—যেমন মনোবৃত্তি, একধরমের চিন্তা আর কল্পনা আর এক ধরনের—economic life বা অর্থনৈতিক জীবন। তা আমাদের বহুদিক ব্যাপ্ত করে

গড়ে তুলেছে তিল তিল করে বহু যুগ ধরে ধীরে ধীরে। আপাত প্রয়োজনে তা আমরা ভুলে যাই। —'বাঙালীর পূর্বপুরুষ যখন বৌদ্ধ হিন্দু বা মুসলমান এর একটাও ছিল না, দ্রাবিড় নিষাদ আর কিরাতের আদিম ধর্ম যখন সে পালন ক'রত, তখন সে অলৌকিক-শক্তিশালী ধর্মগুরুতে বিশ্বাস করত। এই প্রকার গুরুর মৃত্যুর পর তার দেহ মাটিতে পুঁতে তার উপরে মাটি বা পাথরের ঢিবি সাজিয়ে দিত, সমাজের মঙ্গলের জন্য সপ্তাহে একদিন ঢিবি পরিষ্কার করত, তাতে ফুল দিত, সুগন্ধি দিত, প্রদীপ জ্বালাত। এই ঢিবিকে ব'লত 'এডুক'। পরে এই এডুক হল বৌদ্ধদের হাতে স্তূপ বা চৈতন্য, হিন্দু ধর্মাবলম্বলীর হাতে সাধু সন্তের 'সমাধী', আর ধর্মান্তরিত বাঙালী মুসলমানের হাতে তার রূপ হ'ল বা নামকরণ হল 'পীরের কবর' বা 'দরগা' বা 'আস্তানা'।" (চট্টোপাধ্যায় সুনীতিকুমার—বাঙালীর সংস্কৃতি। বাংলা একাডেমি। (২০০৫)। বদলে গেল সাংস্কৃতিক মনন। এইভাবে বদলে গিয়েছি আমরা, পরিবর্তিত করেছি নিজেদেরকে কখনও অপরকে সমন্বয়ের সংস্কৃতিতে আপন করে, কখনও সংঘাতের দ্বন্দ্বে কেড়ে নিয়েছি—বুদ্ধাকে করেছি অবতার, তারই আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে নতুনের জন্ম দিয়েছি কতো তার হিসেবে করে দেখেছি কি ঠিক করে? সঙ্গীতের মীড়ের মতো আমাদের জীবনসঙ্গীতের ধারায় সেগুলো উত্তরাধিকার হিসেবে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে। তাকি কখনো নিন্দার্থক হতে পারে? বিপুল আদিবাসী, জাতি, উপজাতির, উপেক্ষিত মানুষের যে জনস্রোত কালের গভীরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে আসলে তাঁরা আমাদের আদি-অধিবাসী, আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের গৌরবময় প্রাক্ অতীতের প্রতিনিধি। তাঁদের উত্তরপুরুষ আমাদেরই একই জীবনধারার সমান অংশীদার। জাতীয় সম্পদ—আজকের গোটা মানবজাতির উত্তরাধিকারের সমান দাবিদার।

গ্রন্থপঞ্জী :

চট্টোপাধ্যায় সুনীতিকুমার। নির্বাচিত রচনা সংকলন। মিত্র ও ঘোষ। ১৪১৭।

চট্টোপাধ্যায় সুনীতিকুমার। বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা। অষ্টম সংস্করণ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৭৪।

দীপঙ্কর ঘোষ। বাঙ্গালা সাময়িকী পত্রে আদিবাসী কথা। লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র। ২০০৫।

মজুমদার পরেশচন্দ্র। সংস্কৃত ও প্রাকৃতভাষার ক্রমবিকাশ। দেজ। ১৯৮৭-৮৮।

রবীন্দ্র রচনাবলী। শতবার্ষিকী সংস্করণ।

সরকার তপতীরাণী বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার। বাংলা একাডেমি ঢাকা। ২০১৩।